দৈনিক সংবাদ

873 4

তারিখ 30 AUG 1987
পৃষ্ঠা 6 কলাম 5

তৃতীয় চিন্তা

প্রসঙ্গ ঃ শিক্ষাঙ্গনে সাংস্কৃতিক তৎপরতা

আমাদের দেশে মোট জনসংখ্যার অর্ধেকই হচ্ছে শিশু-কিশোর (১-১৪)। এই 'শিশু-কিশোররাই আগামী দিনের নাগরিক'—এই বহুল উচ্চারিত সত্যকে সামনে রেখে বলা যায় আমাদের সন্তানদের প্রতিভা ও সৃজনশীলতার চর্চা, বিকাশ এবং লালনের ক্ষেত্রে কি আমরা খুব একটা সুযোগ করে দিতে পারছি? তাদের মানসগঠন প্রক্রিয়া কতোখানি যোগ্য সংস্কৃতিবান ও সুনাগরিক হয়ে ওঠায় সহায়ক? তাদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে তারা কতোটুকু সুযোগ পাচ্ছে?—এ নিত্য-জিজ্ঞাসা আমাদের প্রায় প্রতিটি অভিভাবকের, প্রতিটি চিন্তাশীল নাগরিকের?

শিশু-কিশোরদের সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্যে শুরু থেকেই তাই তাদের সব দিক থেকে শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান করে গড়ে তোলার পেছনে সব যুগে, সব দেশে শিল্প ও সংস্কৃতি পালন করে আসছে অগ্রণী ভূমিকা।

শিশু-কিশোরদের বিশেষ করে স্কুলের নবীন শিক্ষার্থীদের চিত্তবিনোদনের মাধ্যমে শিক্ষাদান ও সংস্কৃতিবান করে তোলার ব্যাপারে শিক্ষালয়গুলোর ভূমিকা অনেকখানি। সংস্কৃতির প্রায় প্রতিটি মাধ্যমেই শিক্ষার্থীরা প্রাথমিকভাবে গৃহাঙ্গন ছাড়াও নিজ নিজ শিক্ষাঙ্গনে অনুশীলন ও চর্চা করে থাকে। তবে গৃহে সংস্কৃতিচর্চার অনেকেরই সুযোগ ও সামর্থ্য থাকে না। তাদের একমাত্র সহায় নিজ নিজ বিদ্যালয়। যারা বিদ্যালয়ে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে সুযোগ পায় পরবর্তীকালে দেখা গেছে তাদের অনেকেই জেলা, বিভাগ কিংবা জাতীয় পর্যায়ে প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছে।

আজ যাঁরা দেশে গল্প, কবিতা, অভিনয়, নৃত্য, আবৃত্তি, চিত্রকলা, সঙ্গীত শিল্পের এসব শাখায় বরেণ্য ব্যক্তিত্ব হিসেবে স্বীকৃত তাদের অনেকেরই প্রাথমিকচর্চা শুরু হয়েছিলো বিদ্যালয় থেকে। তাই বিদ্যালয় বা শিক্ষাঙ্গনকে বলা যায় প্রতিভার আঁতুড়ঘর।

কিন্তু সাম্প্রতিককালে স্কুল পর্যায়ে সাংস্কৃতিকচর্চা বা প্রতিযোগিতার প্রতি আগ্রহে যেন অনেকটা ভাটা পড়েছে। আগে আন্তঃস্কুল থেকে শুরু করে আন্তঃথানা, আন্তঃজেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা হতো অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশ ও বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনায়। অনেক বিদ্যালয়েই সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, নিদেনপক্ষে মাসিক বিতর্ক প্রতিযোগিতাও হতো। হতো বাৎসরিক নাট্য প্রতিযোগিতা। সঙ্গে থাকতো বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান।

এই কিছু দিন আগেও অনেক সচ্ছল বিদ্যালয় 'কালচারাল ট্রুপ' পর্যন্ত পাঠাতো বছরে অন্ততঃ একবার করে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ও প্রদর্শনীয় স্থানগুলোতে নিয়ে যাওয়া হতো ছাত্র-ছাত্রীদের।

সাম্প্রতিককালের বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে অনেক ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক বিষয়গুলোর অনুপস্থিতিও লক্ষ্যযোগ্য। নিজের শিল্প-সংস্কৃতি সম্পর্কে জানা যায় এমন পাঠ্যপুস্তক

30 AUG 1987

থেকেও বেশীর ভাগ ছাত্র-ছাত্রী বঞ্চিত। যে কারণে তারা ক্লাসের নির্দিষ্ট বিষয় ছাড়া বুদ্ধিবৃত্তি ও মেধা বিকাশের অন্যান্য ব্যাপারে অনেকটা অন্ধকারে থেকে যেতে বাধ্য হয় শিক্ষার প্রথম-অবস্থা থেকেই।

অথচ সংস্কৃতিবান হিসেবে তাদের গড়ে তুলতে শিক্ষাঙ্গনগুলোর তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করার সুযোগ আছে। পাঠ্যসূচীর বাইরে শিল্প-সংস্কৃতির সঙ্গে অনায়াসেই তাদের পরিচয় করিয়ে দেয়া যায়। গল্প, কবিতা, সঙ্গীত, নৃত্য, আবৃত্তি, অভিনয়, চিত্রকলা, যন্ত্রসঙ্গীত—শিল্পের এসব বিষয় শেখানোর ব্যবস্থা করা যায় স্কুলের পড়ালেখার পাশাপাশি। আরও বেশী করে পাঠ্যসূচীভুক্ত তা করা যায়ই। যদিও এখনো এসব বিষয়ে চর্চার ব্যবস্থা আছে। তবে সে সুযোগ দু'একটি প্রতিষ্ঠান ছাড়া প্রায় প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেই অপ্রতুল এবং এমন কি সামান্যতম সুযোগও নেই কোন কোন বিদ্যালয়ে।

খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, অনেক বিদ্যালয়ে শিল্প-সংস্কৃতি, বিশেষ করে সঙ্গীত শিক্ষকের পদ থাকলেও তা বরাবর শূন্যই থাকে। যদিও বা শিক্ষক থাকেন, কিন্তু তাঁকে দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের শিল্প-সংস্কৃতি চর্চা না করিয়ে অন্য বিষয়ে ক্লাস নেয়া হয় দিনের পর দিন। অথচ ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে নিয়মিত এ বিষয়ের জন্য ফি ঠিকই নেয়া হয়। এমন অনেক বিদ্যালয় আছে যেখানে মান্ধাতা আমলের জরাজীর্ণ একটি হারমোনিয়াম বা তবলা থাকলেও তা তেলাপোকার আদর্শ আবাসস্থল হিসেবেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কোনো কোনো বিদ্যালয়ে এ সংক্রান্ত কোনো ফাণ্ডই নেই। তারা অনেকেই সংস্কৃতিচর্চাকে গুনাহ চর্চা মনে করে।

অথচ শিক্ষাঙ্গন বা বিদ্যালয় কেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে উজ্জীবিত করতে পারলে সেই ঢেউ জাতীয় সংস্কৃতিতেও পলি ফেলবে। আজকের স্থানীয় পর্যায়ের নবীন শিল্পীরা আগামীতে অনেকেই হয়ে ওঠতে পারবেন দেশের গৌরব। এ জন্যে শেকড় পর্যায়ে থেকে তাদের গড়ে তোলার প্রয়োজন সবার আগে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক সাংস্কৃতিক তৎপরতার করুণ এই অবস্থায় প্রয়োজন কিছু অন্তর্বর্তীকালীন ও সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ নেয়া। কারণ, সমস্যাটি এক দিনের নয়। এক মাস বা এক দু' বছরেই দেশের সব ছাত্র-ছাত্রীকে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে নেয়া যাবে এমন কথা কেউ বলবেন না নিশ্চয়ই। অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে যেসব বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে এজন্যে ফি নেয়া হয় সেসব প্রতিষ্ঠানে অবিলম্বে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড চালু করতে হবে। গানের শিক্ষক-শিক্ষিকাকে দিয়ে পারতপক্ষে অন্য ক্লাস না নেয়াই ভালো। তাহলে তাঁর মূল দায়িত্ব পালনে ব্যাঘাত সৃষ্টি হতে পারে।

প্রচার মাধ্যমে, বিশেষ করে বেতার-টিভিতে উপজেলা থেকে জাতীয় পর্যায়ে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

ব্যক্তি উদ্যোগে, সাংস্কৃতিক সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে সংস্কৃতিচর্চা আরও বাড়ানো যায়। এছাড়া স্থানীয়ভাবে তো বটেই, উপজেলা, জেলা, বিভাগীয় ও জাতীয় পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড জোরদার করতে একটি সুষ্ঠু ও বাস্তবভিত্তিক নীতিমালা থাকা বাঞ্ছনীয়। এ দায়িত্বটি অনেকটা শিশু একাডেমী পালন করতে পারে। তারা একটি দীর্ঘমেয়াদী কার্যকর পরিকল্পনা নিয়ে আগামী বংশধরদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে সত্যিকার অর্থে সংস্কৃতিবান নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে এগিয়ে আসাই হবে এ মুহূর্তে প্রধান কাজ।

শিশু-কিশোরদের সুপ্ত বৃত্তিগুলোকে মেলে ধরতে তাদের উপযুক্ত সাংস্কৃতিক পরিবেশে গড়ে তোলা দরকার জাতির বৃহত্তর স্বার্থেই। আর সে জন্যেই তাদের চিন্তা-চেতনা, মেধা-মনন ও প্রতিভা বিকাশের পথে বাধাগুলো দূর করতে বিদ্যালয় বা শিক্ষাঙ্গনগুলো আরও দায়িত্ববান, সচেতন ও আন্তরিক হবেন—এটাই সবার কাম্য।